ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য

ত্রিপুরার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার হলেন ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য। গল্পকার হিসেবেই তিনি জনপ্রিয় ছিলেন, তবে তাঁর 'অগরুগন্ধা' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। তাছাড়া তাঁর রচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধও রয়েছে। এই ত্রিপুরাতেই, আগরতলায় তাঁর জন্ম হয়েছিল, অক্টোবর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল অমিয় ভট্টাচার্য। আগরতলা শহরের ঐতিহ্যবাহী উমাকান্ত বিদ্যালয়ে তিনি তাঁর পাঠ পর্ব শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে বাণিজ্যের স্নাতক হন। পরে ১৯৭৫ সালে এম. এ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর বি. এড. ডিগ্রি পান। শিক্ষকতা দিয়ে ভীষ্মদেব তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটান।

স্কুল জীবন থেকেই তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত ঘটেছিল, এমনটি জানিয়েছেন

Scanned with CamScanner

গল্পকার কালিপদ চক্রবর্তী। ১৯৬০-এর শেষ দিকে কয়েকজন যুবকের উৎসাহ উদ্দীপনায় 'গান্ধার' নামে একটি সাময়িক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ত্রিপুরাকে বিষয় হিসাবে নির্বাচন করে লেখালেখির মধ্য দিয়ে 'গান্ধার' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৪, ত্রৈমাসিক, সম্পাদক কল্যাণব্রত চক্রবর্ত্তী ও অজয় রায়) সে সময় সুধিমহলে আলোড়ন জাগিয়েছিল। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভীষ্মদেব, তিনিই পরিচালক এবং অন্যতম লেখক। ভীষ্মদেবের ছোটগল্পে সমাজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পাঠক আবিষ্কার করতে পারবেন। সমাজ তাঁর ভাবনায় প্রতিনিয়ত জেগে থাকত। তাই আমরা লক্ষ্য করি, তিনি 'গান্ধার' এর প্রথম সংখ্যাতেই অন্যতম সমাজ চিন্তক শিক্ষাবিদ 'ডিরোজিও-র সমাজচিন্তা'কে প্রবন্ধের বিষয় করেছেন।

ভীষ্মদেব স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পণ এর সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। একসময় শিক্ষকতা ছেড়ে আগরতলা জাদু ঘরেও কিছুদিন কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু তিনি যেন নিজের সঠিক কর্মক্ষেত্রটি খুঁজে পেলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে যোগদান করার পর। এখানে সরকারি পত্রিকা 'নতুন ত্রিপুরা' প্রকাশিত হয়। তিনি এর সম্পাদনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানেই তিনি কর্মরত অবস্থায় বিভিন্ন লেখার জন্ম দিয়েছেন। ভীষ্মদেবের পড়াশোনার জগৎও ছিল বহুবিস্তৃত। কালিপদ চক্রবর্তী লিখেছেন "মানিক বন্দ্যোপাধায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, কমলকুমার মজুমদার, তারাশঙ্কর প্রমুখ এবং কিছুটা কাম্যু, সার্ত্র, এলিয়ট যখন যা হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে তাই পড়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অনেকের চেয়েও আলাদা ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রথম চৌধুরী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁদের যাবতীয় লেখার প্রতিও ছিল ভীষ্মদেবের প্রবল আগ্রহ।"[১] লেখা দেবার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অকৃপণ। তবে তাগিদের লেখাগুলোর বেশিরভাগ ছিল রসরচনাধর্মী। তিনি ছোটগল্পও লিখেছেন একেবারে কম নয়। একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ এখানে না করলেই নয়। 'মহাভারত' তাঁকে ভীষণ আকর্ষণ করত। একটু লক্ষ্য করলেই, মহাভারতের প্রতি তাঁর সুতীব্র আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর অনেক গল্পেই মহাভারতের চরিত্র, ঘটনা মহাভারত থেকে নির্বাচিত নামকরণ বিশেষ অবস্থানে রয়েছে।

ভীষ্মদেবের গল্পগ্রন্থ 'বুড়া দেবতার মাচাং' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে ও

১. 'নির্বাচিত ভীষ্মদেব' গ্রন্থের ভূমিকা ('ভীষ্মদেব' শীর্ষ-নামাঙ্কিত) অংশ থেকে গৃহিত। প্রকাশক ঃ অক্ষর, ১৯৯৭। ভূমিকাটি লিখেছেন কালিপদ চক্রবর্তী, গল্পকার।

Scanned with CamScanner

'সমিধ'-এর প্রকাশকাল : ১৯৮৩। ভীষ্মদেব ভূমিপুত্র ছিলেন, ত্রিপুরার মাটির সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য হৃদয়বন্ধন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। মাটি ও মানুষের হৃদয়ের গভীরে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অনুসন্ধানী আলো ফেলতে পেরেছিল। ফলত, এখানকার আদিবাসী মানুষ ও জনজীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনযুদ্ধচিত্র একেবারে দ্ব্যর্থকতার অনুসঙ্গবাহী হয়ে ওঠেছে। বন কেটে মানুষ বসতির বিস্তার ঘটাচ্ছে তারই বাহক হয়ে ওঠেছে ভীষ্মদেবের কোন কোন গল্প। এই মাটিতে নবাগত যারা, জীবনযুদ্ধে সামিল হয়ে নিরীহদের শোষণকে উপজীব্য করেছে, তারাও ভীষ্মদেবের কোন কোন গল্পে অত্যন্ত জীবন্ত। একই সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের বিচিত্র জীবিকাগ্রহণ থেকে শুরু করে লাভবান হওয়া মানুষ এবং নিঃস্ব হওয়া মানুষদের ভীড়, সর্বোপরি তাদের জীবন ভাষ্যই অপূর্ব কথনে হয়ে ওঠেছে ভীষ্মদেবের ছোটগল্প। ভীষ্মদেবের গল্পে জীবনকে হাতে নিয়ে উপলব্ধি করার সুযোগ রয়েছে। বার বার তাঁর গল্প স্থানিকতার প্রভাবে আক্রান্ত হয়, কিন্তু এক সময় আঞ্চলিকতার ঘেরাটোপ ভেঙে তার আবেদন সর্বব্যাপকতা পেয়ে যায়। সহজ বাচন বিন্যাসে একসময় পাঠককে অনুভবের অতল-গভীরতায় নিয়ে যান গল্পকার ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য। গল্পের চরিত্রের ভাবনা জগৎ একসময় পাঠককেও স্পর্শ করে মাত্র নয়, সেই ভাবনা-স্রোত পাঠকের আন্তর্বাচনিকতার অংশ হয়ে ওঠে নিঃশব্দে। অধ্যাপক ও সাহিত্যিক কার্তিক লাহিড়ি বলেন, "ভীষ্মদেব সেই লেখকদের একজন যিনি গল্পের শুরু ও শেষ কোথায় হবে তা বিলক্ষণ জানেন, কারণ তিনি সমাজ সংস্কার থেকে মিনারবাসী হননি তাঁর গল্পের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে ত্রিপুরার মানুষ জন পথ ঘাট আকাশ বাতাস। আর তিনি তুচ্ছ ঘটনা দু'একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ স্বাভাবিক মনোবেগ নিয়ে সৃষ্টি করেন অমোঘ গল্প।"

১৯৬৮ থেকে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নির্বাচিত গল্পের একটি সংকলন হল 'নির্বাচিত ভীষ্মদেব' গ্রন্থটি। কিন্তু গ্রন্থটিতে গল্পগুলি সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত হয়নি। বর্তমান আলোচনায় মুদ্রণকাল অনুসরণ করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

বাঁশের বুকে ফুল

।।ক।।

আদিবাসী-জীবনের বিশ্বাস ও সংস্কারকে অবলম্বন করে গল্পকার ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য রচনা করেছেন 'বাঁশের বুকে ফুল' গল্পটি। গল্পটির আত্মপ্রকাশ কাল ১৯৭৩ সাল। ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ পাবর্ত্য ভূমিতে বাঁশ ও বেত প্রচুর জন্মায়। সুতরাং বাঁশ ও বেতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিশ্বাস-সংস্কার বাস্তব সম্পর্কিত। আর এইসব লোক-উপাদান কীভাবে মানুষের অর্থনীতির বাস্তবতাকে বদলে দেয় তারই অনবদ্য পাঠকৃতি এই গল্পটি। উদ্বাস্তু হবার বেদনা, যন্ত্রণা ও তাঁর প্রতিক্রিয়া বাঙালিকে নিঃসঙ্গতার বহুমাত্রিকতায় বিদীর্ণ করেছে। গল্পপরিসরে বাস্তবতার সেই সফল প্রতিবিম্বনই পাঠক পর্যবেক্ষণ করেন। উদ্বাস্তু জীবনের পরবর্তী জটিল আবর্তন কীভাবে পিষ্ট করে সাধারণকে, নাড়িয়ে দিয়ে যায় ছকে বাঁধা ভাবনা পরিসর, গল্পে তাকেই এঁকেছেন গল্পকার।

ইতিহাসের রথচক্রে বাঙালির জীবন বার বার পিষ্ট হয়েছে। ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়ের ফলশ্রুতিকেও গল্পকার এখানে জুড়ে দিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিকতার ভিন্ন মাত্রা বাঙালিকে উদ্বাস্তু বানিয়ে ছাড়ল। এ সময় বিপন্নতাই হল সাধারণের ভাগ্যলিপি। জীবন সংগ্রামের অন্তহীন সায়রে তখন মানুষের ভেসে যাবার পালা। তবু এক সময় থিতু হয় এই দুরন্ত চলা। আবাদীর বিস্তারে মানুষ প্রয়াসী হয়। ১৯৪৭ সাল—ত্রিপুরার সমতল ও পাহাড়ের মাটি, ছিন্নমূল মানুষ এসে আঁকড়ে ধরে। কোন না কোন ভাবে বেঁচে থাকাটাকে স্থায়িত্ব দিতে চায় তারা।

Scanned with CamScanner

তবু বিচিত্র বিশ্বাস সংস্কারের সঙ্গে অর্থনীতিও কেমন ভাবে যেন মিশে যায়। তখন অদ্ভুত বিপন্নতা মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অস্তিত্বের কৃষ্ণগহ্বরে। গল্পকার এখানে এমনই এক বিমূঢ় বিপন্নতাকেই এঁকেছেন।

ভীষ্মদেব এই গল্পে ত্রিপুরা ও পাকিস্তানকে প্রেক্ষাপট হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এর সঙ্গে সময় চেতনাও পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। সময়:স্বাধীনতা আন্দোলন; ফলশ্রুতিতে ঘটল দেশবিভাগ। মানুষ যে জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, বৃত্তি বিভাজিত বাঙালির সমাজ জীবন যে ভাবে বিন্যস্ত ছিল, দুরন্ত সময়ের আকস্মিক মোড় পরিবর্তনে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। সময়ের পালাবদলে মানুষ নতুন বৃত্তি গ্রহণ করে – অনেক অদ্ভুত ধরনের বৃত্তিও জন্ম নেয়। গৌরাঙ্গার মা কোনদিন হিন্দুবাড়িতে মুরগি পালনের কথা ভাবতেও পারত না। কিন্তু গৌরাঙ্গা মুরগি পালন করতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, এক সময় গৌরাঙ্গা তার জীবন-পরিচালনায় অর্থনৈতিক ভিত্ হিসেবে এটিকে গুরুত্ব দিতেও শুরু করেছিল। বলাই, চাষি হলেও তার কাছে চাষাবাদের তেমন গুরুত্ব নেই। বরং সে এক নতুন ধরনের ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। সেটি হল 'সীমান্ত ব্যবসা' বা 'ব্ল্যাক'। একই সঙ্গে, গৌরাঙ্গা কিন্তু তার বংশপরম্পরায় প্রচলিত বৃত্তি ছাড়তে পারেনি।

।। খ।।

'বাঁশের বুকে ফুল' গল্পটি গৌরাঙ্গা'র জীবনযুদ্ধে ব্যর্থতার এক দিনলিপি। ব্যর্থতা তার নিজের কারণে নয়, সে তো বেঁচে থাকার জন্য প্রতিকূলতার পাহাড় ঠেলে ধরেছে। কিন্তু তবু অদ্ভুত অসহায়তা ও বিপন্নতা এক সময় এসে তাকে দুঃসময়ের প্রান্তসীমায় দাঁড় করিয়ে দেয়। পূর্বনির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় নয়, তার ভুলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, তবু অনাকাঙ্খিত আঁধার তাকে বিপন্ন করে। জীবন সংগ্রামের তীব্র গতি এক লহমায় যেন স্তব্ধ হয়ে যেতে চায়।

গৌরাঙ্গা, হরিদাস, প্রফুল্ল, জীবনঠাকুর এরা সবাই পাকিস্তান ছেড়ে এসেছে। এমন সুতীব্র জীবন যুদ্ধ যে তারা যেন মুখের ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে। তবু গৌরাঙ্গাদের থেমে থাকলে চলে না। তাই সে মুরগির বাচ্চা কিনে আনে। বাঁশ কেটে এনে খাঁচা বানায়। সেগুলোর সেবা-যত্নে মনোনিবেশ করে। সরকার থেকে পাওয়া আড়াই কানি জায়গায় সে পাটচাষের চেষ্টা করে। ক্যাম্পে থাকতে থাকতেই বাপ মরে গেলে সরকারের দেওয়া 'ডোলে'র টাকায় শ্রাদ্ধটা সেরে নিতে পেরেছে।

Scanned with CamScanner

"বাপের শ্রাদ্ধটা শেষে গৌরাঙ্গা দেখল মাত্র কয়েকটা টাকার নোট অবশিষ্ট। তখন ক্রমশ একটা দুর্বোধ্য অন্ধকারের রেশ তার মাথার মধ্যে খেলা করতে লাগল।"

সরকারি বাবুরা গৌরাঙ্গার মাথায় স্বপ্নের বীজ বপন করে দিতে পেরেছিল। কিন্তু মাটিতে ফসল বুনে স্বপ্নকে বাস্তব করার কাজটি যে কত কঠিন তা গৌরাঙ্গার বোধের অগোচরে ছিল না। কঠিন মাটিতে ফসল ফলানো যেন পাথরের বুক বিদীর্ণ করে ফুল ফোটানো। গৌরাঙ্গা বেঁচে থাকার বিকল্প পথ সন্ধানও করেনি তা নয়। সময়ের খাঁজে খাঁজে, লুকিয়ে রয়েছে বিচিত্র বৃত্তি ও জীবিকার পথ। বলাই উদ্বাস্তু হয়েই এসেছিল। তারও চাষবাস করার কথাই ছিল। কিন্তু সে বেছে নিয়েছিল অন্ধকারের বৃত্তি। বলাইর বৃত্তিটি কী তা অনেকের মতো গৌরাঙ্গারও আগ্রহের বিষয় ছিল। হঠাৎই সে অদৃশ্য হয়ে যেত। যখন গ্রামে আসত, নিয়ে আসত চাল-ডাল বউয়ের শাড়ি। গৌরাঙ্গাও একদিন জানতে চেয়েছিল "বলাই ক্ষেত করিল না, ধান, চাল করলি না টাকা আনলি কৈথিকারে?" বহু বিস্ময়মাখা জিজ্ঞাসা ছিল গৌরাঙ্গার। বলেছিল, "জাত-কাজ থুইয়া ব্যবসা করস? 'বলাই জানিয়েছিল, সে ভারত পাকিস্তান সীমান্তে ব্যবসা করে – 'ব্ল্যাক'।"

গৌরাঙ্গা কী শ্রমই না করে। কোনদিন যে মাটিতে কেউ ফসল ফলায়নি, সেখানে ফসল ফলানোর শ্রম গৌরাঙ্গার উপলব্ধির আওতাভুক্ত। আর ত্রিপুরার এই মাটিতে রয়েছে অদ্ভুত এক ধরনের লতানো গাছ। এগুলো শুধু বেড়েই চলে। "লতাগুলো কেটে ফেল্লে আবার গজায়। কী লতা? রিফিউজি লতা, ... হাসি আসে, মরেও মরে না, বেঁচে থাকার কী দুর্দান্ত ইচ্ছা।"

গৌরাঙ্গা বেঁচে থাকার সুতীব্র তাড়নায় প্রাচীন সংস্কার ভেঙেছে। মুরগি পালন করতে শুরু করেছে। তার মা সংস্কার ভাঙতে চায়না, আবার বিপরীত ক্রমে অর্থনীতির সমকালীন ছকটাকেও যেন কিছুটা বুঝে উঠতে পারছে। মুরগির বাচ্চাগুলো যখন উঠানময় ছুটে বেড়ায় তখন দূর দূর করে সত্য, "তবে কয়েকটা পড়ে থাকা ভাতও দেয়, সন্ধ্যাবেলা খাঁচাটার দড়জাও আটকে দেয়।"

উল্টো স্রোতে মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির ঘূর্ণি পিষ্ট করে ফেলতে চায় গৌরাঙ্গাকে। এরই মধ্যে তুলসী মা হবে, 'এখন তখন অবস্থা'। সংসারে মানুষ বাড়বে, তাই আরো ফসল চাই। গল্পকার বাজার-অর্থনীতিকে গল্পশরীরে মিশিয়ে দিলেন। নিম্নবর্গীয় মানুষের তালিকা থেকে তাই গৌরাঙ্গাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না। পাঠক লক্ষ্য করেন, গৌরাঙ্গা সময়ের অসুখে আক্রান্ত। তাই নষ্ট সময়ের

Scanned with CamScanner

পাকে চক্রে অমানবিক ভাবনা ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হয়। এরপরই গল্পশরীরে আসে এক অদ্ভূত দ্বিমাত্রিকতা। দুইয়ের গতি সমান্তরাল। গল্পকার অমোঘ উচ্চারণে তারই সূচনা ঘটালেন গল্পশরীরে। একই সঙ্গে গৌরাঙ্গার হৃদয়ে জাগে হিমঋতুর স্তব্ধতা। তিনি বললেন, "অঘটনটা ঘটল সেই রাতেই।" মোরগের খাঁচার দরজাটা সে আটকাতে ভুলে গিয়েছিল। আতুড় ঘরে তখন ল্যাম্প -এর লালচে আর কালো-রঙের আলোয় মেশামেশি, রহস্যময়তার সৃষ্টি করে চলছিল। আর এমনি সময়, "তুলসী মা হয়ে গেল। উঠোনের মধ্যে বসে গৌরাঙ্গা শুনল তীক্ষ্ণ কান্নার ধ্বনি।" এই কান্নার পরেই গল্পশরীরে যুক্ত হয়ে যায় ভিন্ন ব্যঞ্জনা। "সন্ধ্যাবেলা বাজারে গৌরাঙ্গা শুনে এসেছে বাঁশ গাছে ফুল এসেছে, বাঁশ গাছে ফুল এসেছে।" বাঁশের ফুল কোন ক্লান্তি অপনোদনকারী, চিত্তস্নিগ্ধকারী সুবার্তা বহন করে আনে না। কারণ বাঁশে ফুল মানেই হিমশীতল নীল মৃত্যুর হাতছানি।

।। গ।।

গল্পে আরো সমান্তরাল রেখা বেড়ে যায়। প্রতি রেখার গায়ে আনুবীক্ষণিক বিভঙ্গ। মা আর ধাইয়ের মুখে হাসি, নবজাতিকার জন্য। কিন্তু ভাবনার বৃত্তে খাবি খেতে থাকে গৌরাঙ্গা। একরাশ অক্ষমতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য – গৌরাঙ্গা সহায়হীনের ক্রোধে ক্ষয়িত ও নিঃস্ব হতে থাকে। গৌরাঙ্গা ক্রমশ দুঃসময়ের বিবরে শুধু 'কালো' প্রত্যক্ষ করে। শব্দের মিশ্র-কলতান তার চেতনাকে বিবশ করে দিতে থাকে। "ধাই ও বুড়ি মা হাসছে – মেয়ে হয়েছে, আমার মেয়ে–মার গলা, শুনছো নি গৌরাঙ্গা? বাঁশের গাছে ফুল ফুটেছে – আকাল - আকাল আসতেছে – গদীর উপর বসে থাকা বড় পালের দিকে তাকিয়ে ছিল, টাকা কয়টা ফসল উঠলেই শোধ – সুদ সহ –।" বড় অভাবে জড়িয়ে গেছে গৌরাঙ্গা। তার উপর আবার নবজাতকের এই পৃথিবীতে আসা ঠিক হয়নি। আকাল মানেই আসন্ন দিনে জমি হবে বন্ধ্যা। বৃষ্টিহীনতার জন্য রবিশস্যও হয়নি। আর আকালও আসন্ন। এমনই বার্তাই বয়ে আনছে বাঁশ-ফুল। সুতরাং শোষক মহাজনেরা কোন ভরসায় মানুষকে টাকা ধার দেবে? আকালে, যদি মরে যায়, ঋণগ্রহীতা – তাহলে সুদ-আসল দুটোই যাবে। স্পষ্টতই গল্পে মহাজনী শোষণের স্বরূপটি ব্যঞ্জনা পেয়ে গেল। ঔপনিবেশিক সমাজবৃত্তে নিম্নবর্গীয়ের প্রত্যাখ্যাত হবার এ-ও এক অমোঘ স্বরূপ।

Scanned with CamScanner

এতদিন ধরে বেঁচে থাকার যাবতীয় প্রষ্টোয়ও যেন ভাঁটার টান। তাই বিরক্তি আর ক্রোধ এসে ভীড় জমাল মনের দরজায়। তুলসী বাজার থেকে জিলিপি আনতে বলেছিল। "যাবার আগে আদুরে গলায় বলেছিল আমার লাইগ্যা কয়টা জিলাপি আনবা গো?" গৌরাঙ্গ ক্রোধী হয়ে উঠছে ক্রমশ। তুলসীর জিলিপি খাবার ইচ্ছাটাকে সে ভেতরে ভেতরে ব্যাঙ্গ করে। "ধান গাছ গুলি যখন খড় হয়ে গেল মাটির উপর তখন মাগী বাচ্চা পোয়াবে? জিলাপি খাবে?"

।।ঘ।।

এতো যে প্রতিকূলতা, তবু বেঁচে থাকার প্রয়াসতো মানুষ থামিয়ে রাখতে পারেনা। স্রোতের টানে ভেসে যাবার আগে খড়-কুটোকে আঁকড়ে ধরে মানুষ বাঁচতে চায় – কীসের বিনিময়ে আপাতত টিকে থাকা যায়, মনের ঘরে তারই অনুসন্ধানে নামে গৌরাঙ্গ। কল্পনায় হাতড়ে বেড়ায় নিজস্ব সম্পদের তালিকা। "দুটো থালা, গেলাসটা নেই, টোল খাওয়া ঘটিটা আছে, সেই ফুল তোলা টিনের বাক্সটা তুলসীর বিয়ের, কোনটা – ?" গৌরাঙ্গার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার শূন্য। তিনটি মোরগই এখন তার সম্বল। সুতরাং এগুলো বেঁচে দেওয়া যায়। তাহলে দশটি টাকা হাতে আসবে আপাতত। মোরগের বাচ্চাগুলোই তার আশার আলো এই মুহূর্তে।

এখানে আমরা গৌরাঙ্গার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। দুর্দশাগ্রস্ত এই জীবন যাত্রার নেপথ্যে দেশভাগ এক সক্রিয় বিন্দুতে অবস্থান করছে। জীবন সংগ্রাম এত তীব্র যে স্ত্রীর সামান্য চাহিদাও সে পূরণ করতে পারেনা। এতে সে লজ্জিত হয়না, বরং এটিকে সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দৃষ্টিতেই দেখে। ঘটনাপ্রবাহের ক্রমিক অগ্রগমন ঘটছে, একই সঙ্গে জীবন প্রবাহ ক্রমশ হচ্ছে পশ্চাদমুখী। গৌরাঙ্গ শেষ পর্যন্ত বন্যাস্রোতে ভাসমান খড় কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে মোরগের তিনটি বাচ্চাকে। অস্তিত্বের প্রকাশ্য ও নিভত স্বর বিচিত্র বিভঙ্গে গল্প শরীরকে ভাগ্য-পরিহাসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। গৌরাঙ্গার সচকিত আর্ত-চিৎকারে ভেঙে পড়া শরীরী কাঠামোটি এক-লহমায় দেখে পাঠক নিজেও যেন ভেঙে পড়েন হতাশায়। গৌরাঙ্গার তিনটি মোরগের বাচ্চা ধূর্ত শেয়ালের শিকার হয়ে গেছে রাতের নৈঃশব্দে। "এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে গৌরাঙ্গ দেখতে পায় একটা পড়ে আছে রক্তাক্ত, ঘাড় বাঁকা – আর দুটোর পাত্তা নেই।"

Scanned with CamScanner

এই মুহূর্তে গৌরাঙ্গ অন্তরে রিক্ত, নিঃস্ব হয়। তার অন্তরের অনুক্ত কান্না ও অদ্ভুত ভয়ের শিহরণ তাকে মূক করে রাখে। গৌরাঙ্গার হৃদয়ের কম্পন ও নব জাতকের কান্না যেন বিশ্বময় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এইভাবেই 'কিউবিজম' বহু দ্যুতি ছড়ায়। আর পরিশেষে আকালের বার্তাবাহী 'বাঁশ গাছে ফুল' গল্পকে পৌঁছে দেয় অনন্যতার উত্তুঙ্গ শিখরে।

Scanned with CamScanner

একটি সংবাদের জন্মকথা

।।ক।।

ত্রিপুরার বুকে অস্থির সময় একেবারে কম আসেনি। ক্ষুদ্র এখটি ভুখণ্ড। অথচ রহস্যময় কারণে বারে বারে কেঁপেছে এখানকার মাটি; সর্বনাশা পরিস্থিতিতে লুণ্ঠিত হয়েছে মানবতা, মহাশূন্যে মিলিয়েছে মানুষের প্রাণকণা। ১৯৪৭ সাল এর পর এখানে এসে আছড়ে পড়েছে ১৯৭১ সাল। ১৯৭১ এর পর এখানে এসেছে ১৯৮০ সাল। সে-ও এক ভয়ংকর সময়। এখানকার মানুষেরা পূর্ববর্তী দু-দুটো মহাপ্রলয় কে সামলে উঠেছে সত্য, কিন্তু ১৯৮০ তে এসে বিমূঢ়, বিস্মিত ও বিপন্ন হয়েছে। রাজনীতির ব্যূহ এখানকার মানুষকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরেছিল। কিন্তু বুঝতে পারা যায়নি নেপথ্য ঘাতক কে! সে-ই সংঘাতের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক।

গল্প-অবয়বে জড়িয়ে আছে ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিসর এবং স্থানিক জন-চরিত্র। ১৯৪৭-এর পর, ১৯৭১- এর উত্তাল জনস্রোত যখন আছড়ে পড়েছিল ত্রিপুরার মাটিতে, সেদিনও ত্রিপুরা কাউকে ফিরিয়ে দেয়নি। এই মাটিতে সবারই ঠাঁই হয়েছিল। রাজ্যের পার্বত্য ভূমি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ছিল অদিবাসীদের বাসভূমি। তাই বহু-অভিজ্ঞ বাঙালিরা আদিবাসীদের সঙ্গে মিলে-মিশে এগিযে চলার অলিখিত নীরব শর্তে আনুগত্য দেখিয়েছিল। এর মধ্যে কোন ছলনা ছিল না। এভাবেই ১৯৪৭ এর পর ১৯৭১ অতিক্রম করে একসময় এসে পৌঁছানো গেল ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে।

Scanned with CamScanner

এখানে এসে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন একটি রাজ্যের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থানের,– এই সময় রাজ্য মন্ত্রীসভায় ছিলেন একটি বাম-আদর্শচালিত রাজনৈতিক দলের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, তাঁরাই এই রাজ্যের আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন এবং গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভারতের আদিবাসীদের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনা আর নেই। কিন্তু একদিন আদিবাসীরা ক্ষিপ্ত হল। বাঙালিরা শঙ্কিত হল। হয়তো তারা আক্রান্ত হবে, এই ভয় তাদের তাড়িত করতে শুরু করল। তাই প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ শুরু হল। এরই মধ্যে কী করে যেন আদিবাসী-বাঙালিদের দুটো দল মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হল। মানুষের প্রাণ গেল। সংঘর্ষ, আতঙ্ক, আর প্রস্তুত থাকার তাড়না, প্রতিরোধ অথবা মৃত্যু, প্রাণ দাও-নাও মানসিকতার নিকষ কালো অন্ধকারে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং বাঙালিরা নিমজ্জিত হল। সেদিন কী ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা এবং সংবাদপত্রগুলোই বা সেদিন কোন্ পথ ধরে এগোচ্ছিল, তারই এক জীবন্ত আলেখ্য এই 'একটি সংবাদের জন্মকথা' গল্পটি। গল্পকার স্পষ্টতই সংবাদপত্রের অবস্থানের প্রতি এখানে আলোকপাত করেছেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতারাই-বা সেদিন কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারই সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছেন গল্পটিতে। সর্বোপরি, গল্পকারের অবস্থান সম্পর্কেও পাঠক একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সুযোগ পেয়ে যান নিঃসন্দেহে।

।।খ।।

সাংবাদিকেরা স্টোরি লেখেন। তাদের শুধু সংবাদটিকে হুবহু তুলে ধরলে চলে না। কেননা, পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় না। পাঠকদের কাছে টানতে না পারার তাৎপর্য হল, সাংবাদিকদের ব্যর্থতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে রুটি-রোজগারের প্রশ্নটি। সাংবাদিকদের তাই স্টোরি লেখার দক্ষতা থাকতে হয়। আগেই উল্লেখ করা গেছে, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের অস্থির সময়কালকে অবলম্বন করেই এই গল্পের আত্মপ্রকাশ। সর্বোপরি উল্লেখ্য, সে সময় ত্রিপুরা রাজ্যে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। বলা হত, পাহাড়ি-বাঙালি দাঙ্গা। গল্পকার এক সময় পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে সংবাদপত্র জগতের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিলেন। একই সঙ্গে ত্রিপুরার বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন বলে একটি সুস্থিত দৃষ্টিভঙ্গিতে অতীত ও

Scanned with CamScanner

বর্তমানের দেশ ও বিশ্ব-রাজনীতির নিজস্ব মূল্যায়নের দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন। গল্পে একজন সাংবাদিক সংবাদ তৈরি করতে গিয়ে সম্পাদকের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। বাস্তব যখন কুহকে আবৃত হয়, মিথ্যা সত্যের মুখোশে প্রকাশিত হয় তখন বিবেক-যন্ত্রণায় কোন কোন মানুষ কাতর হয় বৈ কি! কিন্তু মিথ্যাকে ভর করে যারা এগোতে চায় এমন মানুষেরাও তো সংখ্যায় কম নয়। একদিকে ঘোলা জলে শিকার প্রিয় মানুষদের রহস্যময় পদচারণা, বিপরীত ক্রমে সমকালের ক্লেদ-মাখা অঙ্কুশের আঘাতে রক্তাক্ত বিবেকের অধিকারী সংবাদিক অতনু। যা সে প্রত্যক্ষ করেনি, যে তথ্য অসত্য, সেটাকে সত্যে পরিণত করতে হবে জেনে অতনু প্রতিনিয়ত যন্ত্রণায় কাতরায়। বিচিত্র প্রশ্ন তাকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে।

।।গ।।

গল্পটি ১৯৮০ সালের ত্রিপুরার দাঙ্গা পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানুষ সামগ্রিক অবস্থা জানার জন্য সংবাদপত্রের পরিবেশিত সংবাদকে সত্যাসত্য না বুঝেই গ্রহণ করে। অবশ্য এক-একটা সময় আসে যখন সত্য-মিথ্যা বিচারের ক্ষমতা হারায় মানুষ। কীভাবে সংবাদ তৈরি হয় মানুষ তা জানে না। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসে সত্যদর্শনের এই কর্ম প্রক্রিয়ায় কত যে ভেজাল মিশে যায়, তা জানা সহজ নয়। সংবাদপত্রের দর্পনে বিম্বিত হয় যে যৌথ জীবনের কথা তা কখনো সদর্থক হয়, আবার কখনো তা পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর অথবা অগ্নিগর্ভ রূপ দেয়। অতনু সাংবাদিক – ঘটনার প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা এবং স্ব-দর্শনকে বহুজনের করে তোলার দায়বদ্ধতা তার। অতনু দেখছে মানুষ মানুষের বলি হচ্ছে অজ্ঞাত কারণে। ভয়ংকর ভাবে তা দৃষ্টিগোচরও হয় কখনো কখনো। অতনু একটি কঙ্কাল দেখে এসেছে। এই কঙ্কাল যেমন মানুষের তেমনি এটি গল্পেরও কঙ্কাল। সম্পাদকের দেওয়া ঠিকানা ধরে অতনু কঙ্কাল দেখেছে, মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছে। সাক্ষাৎকার নিয়েছে। কিন্তু দপ্তরে ফিরে এসে সম্পাদকের নির্দেশ মতো - 'মেক্ দ্য ষ্টোরি' বানাতে গিয়ে বিপন্ন হয়েছে। সম্পাদক যা চাইছেন তা অতনুকে ক্রমান্বয়ে গভীর বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অতনুর 'কিন্তু ভাবকে' ভেঙে সম্পাদক বললেন, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষায় আছে, "ওরা সত্যকে চাপা দিতে চাইছে — আমরা তা মাটির তলা থেকে টেনে বার করব — সব ব্যাটার মুখোশ খুলে দিতে হবে —।"

Scanned with CamScanner

কঙ্কাল দেখে বেটা-ছেলে কি মেয়ে-ছেলের কঙ্কাল তা নির্ধারণ করা বস্তুতই কঠিন। কিন্তু কালো সময়ে বহু অদৃশ্য কারিগরেরা মত্ত হন বহুচরিতায়। সম্পাদকের নির্দেশ তাই অতনুকে বিভ্রান্ত করে, "আমি তো তোমাকে যাবার আগেই বলে দিয়েছিলাম – জেনো ওটা মেয়েছেলের কঙ্কাল –"। এভাবেই ক্রমান্বয়ে সম্পাদক মশায় অতনুকে স্টোরি বানাবার নতুন নতুন উপাদান জোগাড় করে দিতে থাকে। গল্পের শুরুতে অতনু সম্পাদককে বলেছিল "সত্যিই স্যার মাত্র একটা কঙ্কাল।" কিন্তু তা সম্পাদককে তৃপ্ত করতে পারেনি। তাই তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটা দেখেছ তো – জেনো ওটা পনেরো হবে – রিমেম্বার– পনেরো – মেক ইট ফিকটিন – একও যা পনেরোও তাই – কান টানলে মাথা আসবে" – এটাকেই সত্য বানাতে হবে – এটাই অতনুর দায়বদ্ধতা।

অতনুর ভাবনার যাবতীয় উৎসমুখ যেন অদৃশ্য শক্তির নজরদারীতে বাধা পড়ে যায়। পারম্পর্য হারিয়ে বাচনিক প্রদেশে অতনু হাল ভাঙা এক নৌকো যেন। অতনু সম্পাদকের সহজ স্বাভাবিক উক্তিতে বিস্মিত হয়। কী ভাবে মিথ্যাকে সত্য বানাতে হয়। অতনু তা শেখেনি। "এখন একটাকে পনেরো বানাবে কী ভাবে? কেমন একটা সরল প্রশ্ন ওকে ঠোকর মারছিল ভেতর থেকে। ঐ লোকগুলোর সাথে যদি আর কোনদিন দেখা হয়?"

সংবাদপত্র জনমত গঠনের দায়িত্ব বহন করে। কিন্তু কার পক্ষে এবং কীভাবে? সে কি সত্যের পক্ষে? সত্যের সংজ্ঞা কী ভাবে নির্ণীত হয়? অতনু জানে, একটি রিপোর্টিং এর জোরে কোন জায়গায় পরিস্থিতি কীভাবে গতি-পরিবর্তন করে। "কাল সকালে নগরী উত্তাল হয়ে যাবে – পনেরোটি নারী কঙ্কাল উদ্ধার—" মানুষকে উত্তেজিত করা এবং আক্রমণমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের এমন সংবাদের গুরত্ব অপরিসীম। কিন্তু যার গতি সত্যের বিপরীতমুখী তাকে সত্য-রূপ দিতে গিয়ে অতনু বিবেকের দংশনে পীড়িত হতে থাকে। এখানে স্পষ্টতই, গল্পকার সংবাদপত্র-সম্পাদকের ভূমিকাকে সন্দেহের তালিকাভুক্ত করেছেন। কিন্তু বেতনভুক্ কর্মচারি অতনু কী করে সম্পাদককে অস্বীকার করবে। তাহলে টান পড়বে তার রুটি রোজগারে, বিপন্ন হবে তার জৈবিক চাহিদার ক্ষেত্রটি। গল্প-পরিসরে বিপন্ন অতনুর মুখচ্ছবি পাঠকের মনের পর্দায় ফুটে ওঠে। কিন্তু এটাও প্রশ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে – পরিস্থিতিকে এমন তাতিয়ে তোলার নেপথ্যে সম্পাদকের কোন্ উদ্দেশ্য রয়েছে? কোন্ উজ্জ্বল ভুবন হাতছানি দিচ্ছে সম্পাদককে, যার জন্য একটি

Scanned with CamScanner

কঙ্কালকে পনেরোটি কঙ্কালে রূপান্তরিত করতে হয়। স্বতঃই পাঠক ভাবেন, সম্পাদকের ভূমিকায় তিনি বিস্মিত হন। সম্পাদকের হৃদয়-গভীরতা থেকে চিন্তা সূত্রগুলো পরিকল্পিত আকার ধরে বেরিয়ে আসে ক্রমশ। পাঠক লক্ষ্য করেন, কঙ্কালের সঙ্গে নিঃশব্দে মিশে যায় 'মেয়ে-ছেলে' শব্দবন্ধ; ফলত, পাঠকৃতি হয় 'মেয়েছেলের কঙ্কাল'। অতনু কী ভাবে সাজাবে এই স্টোরি!

।।ঘ।।

পরমূহূর্তে অতনু আরো একটি সত্যের মুখোমুখী পৌঁছে যায়। সম্পাদকের ঘরে অতনু অবিষ্কার করে আরো কিছু মুখ। 'একজন এম এল এ, একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, একজন কনট্রাকটার ও রাজনীতিবিদ–'। তারা আগেও এসেছে, কিন্তু তাদের চাল চলনে রহস্যময়তা চিহ্নাঙ্কিত করে দিয়েছেন গল্পকার। তারা একান্তে সম্পাদকের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন। এরা, এই সব রাজনীতির ব্যাপারীরা এতদিন কাজ ছাড়াই সময় অতিবাহিত করছিল। এখন তারা ভীষণ ব্যস্ত। "রাজ্যব্যাপী ভয়াবহ দাঙ্গার ভয়াবহ দগদগে ঘা। ঘর জ্বলছে, মানুষ মরছে, শরণার্থী, কান্না, অভিযোগ অনেক দিন চুপচাপ থাকার পর কাজের একটা বিরাট সুযোগ এখন।" এরূপ উচ্চারণে নেপথ্যেও লুকিয়ে থাকে ভিন্নতর ভাবব্যঞ্জনা। এর ফলে এই সব রাজনৈতিক নেতাদের মুখোশোর আড়ালে লুকিয়ে থাকা রক্তাক্ত উন্মত্ত দৃষ্টি পাঠক যেন এক লহমায় আবিষ্কার করে ফেলেন। অতনুর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। সম্পাদক এক-কে পনেরো বানিয়েও তৃপ্তি পাচ্ছেন না। তাই এবার সম্পাদকের সংযোজন "আহ একটি তাড়াতাড়ি করো। রাত হচ্ছে। খুব সিরিয়াস ম্যাটার। তোমার রিপোর্টিং এ যেটা ভাইটাল পয়েন্ট হবে, জানতো — ঐ মহিলারা হত্যার আগে ধর্ষিতা হয়েছিল –"। এর পরবর্তী স্তবকে সম্পাদকের কথাকে অতনু তার মনে পর্দার ধরেছে, "গণহত্যার আগে গণধর্ষণ।"

অতনুর ভাবনার জগৎ মথিত হতে থাকে। গল্পকার ক্রমে এমে গভীর থেকে গভীরতায় অতনুর অন্তর-জিজ্ঞাসাকে টেনে নিয়ে যান। একই সঙ্গে পাঠকের জিজ্ঞাসাও শাণিত হয়ে ওঠে। প্রতিবেদক অতনু তার সামনে স্তুপীকৃত উপকরণের কোনটি কতদূর আবশ্যক ও কোনটি কতদূর অনাবশ্যক তা নিয়ে পৌঁছুতে পারেন না কোন স্থির সিদ্ধান্তে। বিচিত্র ভাবনা-ভূখণ্ডে অতনু মানস ভ্রমণ শুরু করে। কিন্তু অতনুর ভাবনা জমাট বাঁধবার অবকাশ পায় না। কারণ সত্য তা নয়, যা সম্পাদক

Scanned with CamScanner

লিখতে নির্দেশ দিচ্ছেন। বরং দাঙ্গার ভয়াবহতার মধ্যেও মানুষ মানুষকে আশ্রয় দেয় "কেমন করে কার ঘরে অন্যকে লুকিয়ে রেখেছিল চার পাঁচ দিন, কেমন করে একটি – ছোট্ট মেয়ে হারিয়ে যায় আবার ফিরে আসে – এই সব।"

সম্পাদক এসব জানতে আগ্রহী নয়। মানুষের আবেগ তাদের মূলধন। সেই আবেগকে সহিংসতায় পরিণত করতে পারেন তারাই আবার বিপরীতটিও তাদের হাতেই। তিনি হয়তো অতনুর মনোভূমিকে ছুঁতে পারছিলেন, যেমনটি পাঠকও তাঁর অনুভূতিতে খুঁজে পাচ্ছিলেন প্রাণের অধিকারী অতনুকে। কিন্তু লাগাম ধরে রেখেছেন সম্পাদক। তিনি চাইছেন অতনুকে তার ভাবনা বলয়ের অংশীদার করতে। তিনি বলে ওঠেন, "– ডু ইয়ু নো –? পনেরো জন নিষ্পাপ মহিলাকে হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে? মায়ের সামনে মেয়েকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে? বর্বরতার শেষ।" একই সঙ্গে সম্পাদকের সহিংস উচ্চারণ, "... একটু ক্ষমতা পেয়েই দেখ কেমন দগদগে ভিয়েতনাম বানায় —"। রাজনীতির নেতারাও যেন এতক্ষণ ধরে ঝিমিয়েই ছিল, তারা যেন প্রাণ ফিরে পেল। সম্পাদক যেন তাদেরও নেতা — স্বদেশ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্বও যেন তার। তিনি গর্জে ওঠেন, "আপনারা মশাই ধেড়ে ইঁদুর। কি করেছেন? পারেন না কেন্দ্রে যেতে? না পারেন তো আমিই যাব — ইয়েস আমি যাব — মুখোশ খুলে দেব —" ইত্যাদি। স্পষ্টই লক্ষ্যণীয় যে, ক্ষমতাসীন সরকারের বিপরীত ভূমিকায় রয়েছেন নেতা-মন্ত্রী-সম্পাদক। আর তাদের যাবতীয় উষ্মা ও অসহিষ্ণুতা সরকারের জন্য, সরকারকে ক্ষমতাচ্যুতই করাতে চান তারা। গল্পকারের অবস্থান এখানে আর গোপন থাকে না। একই সঙ্গে সংবাদপত্রের অবস্থান ও ইতিহাসের পৃষ্ঠা অতিক্রম করে সাহিত্যের পাতায় ভিন্ন আঙ্গিকে হাজির হয়। বিবেকবান মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে গল্পচরিত্র অতনু।

কিন্তু সত্যের সীমানা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হয় অতনুর। অন্তর্গত দহন তাকে যন্ত্রণায় কাতর করে তোলে। সে সংবাদ তৈরি করতে পারছে না। "দেরি হয়ে যাচ্ছে। নিজের ভেতরেই একটা অসহায়ত্ব অনুভব করতে থাকে। চারিদিকের দম বন্ধ করা পরিবেশটা যেন ওকে চাপতে চায়। আগুন, মৃত্যু, হত্যার সংবাদ জোগাড় করে করে এই নিত্য সাজানো, কেমন যেন শ্মশানের লাকড়ির ঠিকেদারী বলে বোধ হয়।" মানুষকে নিত্য বিবাদে ধূসর শূন্যতায় ও আতঙ্কপ্রদ ভবিষ্যতের দিকে মানুষকে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে যে উন্মত্ততা তার বিপরীতে অবস্থানে করছে অতনু। এক সময় সে অদ্ভুত আবেগে তাড়িত হয় সে। একটা দৃঢ়তাও আসে তার চেতনায়।

Scanned with CamScanner

এই মুহূর্তে সে বিবেকবান মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

সম্পাদকের ভাবনাও ক্রমাগত শাখা প্রশাখা মেলে দিয়ে বেড়েই চলে। কাহিনিটি তো আগামী দিন রাজ্যের ভবিষ্যতের নির্ণায়ক-ভূমিকা নেবে। তিনি অতনুকে দিয়েই লিখিয়ে নিতে চান 'স্টোরি'টি। এখানে দুজনের সংলাপের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক।

"অতনু দাঁড়ায়। তাঁর প্রবেশ স্যার টের পান। হাত নামান। চোখ দুটো খোলেন। অতনুর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

– লিখেছ?

– আরম্ভ করেছি।

– এত দেরি হচ্ছে কেন?

– ভাবছিলাম।

– এত ভাবনার কী আছে?"

এখানে নাটকীয়তা আছে। এর মধ্যে দিয়েই গল্পকার তাঁর গল্পকে শিল্প চূড়ায় নিয়ে যেতে চান। মানুষের স্বাধিকার বোধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ দ্বিবাচনিকতায় আরোহণের সূচনা এরূপ :

"তুমি যেখানে গিয়েছিলে সেখানে মেজরিটি কারা? অতনু প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারে না। বিস্মিত কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

– বুঝছ না? মানে সেখানে কারা বেশি?

– সাব ডিভিশনের পাহাড়ী এলাকায় তো সংখ্যায় ওরাই বেশি।

– যেখানে কঙ্কাল দেখেছ?

– ওরাই বেশি।

– গুড্। তাহলে ঐ কঙ্কালগুলো কাদের? বুঝতে পারছ কাদের? সংখ্যায় যারা কম সেখানে, তাদের ঘরের মা, মেয়ে বোনদের।"

একে নিছক 'স্টোরি'র ছক বললে, যাবতীয় বলাটাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। কেন না এ-স্টোরির শরীরী বিভঙ্গে বারুদ বাধা রয়েছে গোপনে — আত্মঘাতী বিস্ফোরণের যাবতীয় উপাদান গ্রহণ করে, সেটি অগ্নিকান্ড ঘটাবে। তার আগ্রাসী দহনে দগ্ধ হবে মানুষ ও মানবতা।

কিন্তু অতনু তো স্থবির নয়, তার অভ্যন্তরে বিষম ঘূর্ণি। অতনু তো আসলে গল্পকারের অপর সত্তা। তাই ভাবাদর্শগত অবস্থানেই অতনু স্বপ্রকাশিত হয়। তা

Scanned with CamScanner

একাধারে নীলঘূর্ণির চোরাস্রোত থেকে বেড়িয়ে আসা, অন্য দিকে যেন মানুষের মুক্তির দিক-নির্দেশিকা। তাই গল্পের অন্তিমে অতনুর উচ্চারণ অমোঘ :

"স্যার আমিতো কিছুই জানি না। আরো কত কি আছে হয়ত। স্যার এ নিউজটা যদি আপনিই দয়া করে করেন। ... স্যার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। অতনু কয়েকটা মুহূর্তের নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে আসে।" বিপ্লবী সম্ভাবনার ভগীরথ-চরিত্রকেই পাঠক অতনুর মধ্যে আবিষ্কার করেন।

আলো আর অন্ধকারের প্রকরণে গড়ে ওঠা পরিমণ্ডলে সম্পাদকের অবস্থান অগ্রাহ্য করেই অতনু বেরিয়ে আসে। শক্তিশালী স্বার্থবাদীদের বলয় সে আপাতত ভেদ করেছে। এবার তার শুধুই পথ চলা, উৎস তার জানা হয়ে গেছে।

Scanned with CamScanner